সংবাদ
তারিখ 25 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

বৃহৎ জনবহুল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বসবাস করে আলো-আঁধারে নিমজ্জিত কাদামাটিতে জলমগ্ন গাঁও-গেরামে। তাদের জীবনমান নিম্ন পর্যায়ের। তারা বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারে থাকে শঙ্কাগ্রস্ত ফলে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার প্রভাবে জীবন যাত্রার উন্নয়ন ঘটে ধীরগতিতে। অভাব, অনটন ও দারিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াই করে নিবু নিবু কুপির আলোর নিচে পিষ্ট হতে থাকে তাদের নিত্যদিনের হাসি-কান্না। উন্নত শিক্ষা যাকে বলে সুশিক্ষার ছোঁয়া থেকে তারা থাকে বরাবরই বঞ্চিত। অথচ এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা না গেলে দারিদ্র্য বিমোচন বা জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষ জানে না তার সন্তানকে কি শিক্ষা দিতে হবে। তার সন্তানকে স্কুলে পাঠাবে না মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করবে এ ধারণা নিতে ফুরিয়ে যায় মূল্যবান সময়। অতপর তার শিশু সন্তানটিকে কাছের কোন বিদ্যালয়ে বা মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেয়।

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মা-বাবা থাকে অক্ষরজ্ঞানহীন। তারা সন্তানকে প্রাথমিক অক্ষর পরিচয় শিক্ষা নিজেরা দিতে পারে না। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর হয় অধিক নির্ভরশীল। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বহু শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট স্টাইলে পড়িয়ে যায়। যে সব শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে তাদের পড়া আত্মস্থ করতে পারে তাদের পরবর্তী শিক্ষায় এগিয়ে যেতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে শিক্ষার্থী শিক্ষকের গতিধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে না পারে, তার উপায় হবে কী? সে তো লজ্জায় বা ভয়ে শিক্ষকের কাছে পরবর্তী অক্ষরটি বা অংশটি জানতে সাহস পায় না। আবার বাড়িতে গিয়ে মা-বাবার কাছে শিক্ষা নিতে পারে না। দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, জেলে, তাঁতি, ঠেলাওয়ালা ইত্যাদি নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মা-বাবার সন্তানটি স্কুলে গেল কি-না, আবার সন্ধ্যায় বা সকালে পড়তে বসল কি-না, সে খোঁজ রাখতে পারে। কিন্তু পড়ায় বসলেই হবে না, সে পড়ল কি-না, কতটুকু পড়ল, আদৌ সে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পড়ছে কি-না ইত্যাদি খবরা-খবর রাখবে কে? বর্ণমালা পড়ার সময় ক, খ-এর পরবর্তী অক্ষর বা ভুলে যাওয়া অন্য কোন অক্ষরটি মনে করিয়ে দিবে কে? এ শিক্ষার্থী তার পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষককে পড়া দিতে পারবে না। তখন শিক্ষক হয়তো বা কড়া ধমক দিয়ে শিক্ষার্থীকে বসিয়ে দিবেন। কিন্তু তলিয়ে দেখবেন না, কেন এই শিক্ষার্থী পড়া শিখছে না। তলিয়ে দেখলেই বা তার কী করার থাকবে। কেন না পল্লী অঞ্চলের প্রতিটি শিশুর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা পরিচয় দিতে পারবে না বা ক্লাসের বাইরে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অতেল সময় দেয়ার মতো পরিবেশ নেই।

ওই শিক্ষার্থীর কাছে পড়াশোনা বস্তুটি ক্রমাগতভাবে নিরাসক্ত পদার্থে পরিণত হবে। স্কুলে আসতে বা ক্লাসে হাজির হতে ইচ্ছে করবে না। সে পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না। আবার টেনে টুনে প্রাথমিক দিকের শ্রেণীগুলো উতরিয়ে গেলেও জ্ঞানের ভিত শক্ত না হওয়ায় পরবর্তী শ্রেণীতে বিষয়বস্তুগুলো জটিল মনে হতে থাকবে। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিজের অজান্তে পড়াশোনার জগৎ থেকে হারিয়ে যাবে। এভাবেই গাঁও-গেরামের অগণিত শিক্ষার্থী শিক্ষার প্রাথমিক স্তর ক্রমান্বয়ের পরবর্তী স্তর থেকে ঝরে পরে। এমনিতর ক্ষেত্রে ঝরে পরা শিক্ষার্থীটিকে তার দুর্ভাগ্যের জন্য কী দায়ী করা যাবে?

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বই সরবরাহ করছে, দিচ্ছে আর্থিক সাহায্য হিসেবে উপবৃত্তি। প্রাথমিক শিক্ষাকে করেছে সবার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। তারপরও কিছু শিশু রয়েছে যাদের বলি পথশিশু। এরা পড়াশোনার ধারেকাছেও যায় না। দু-একবার বিদ্যালয়ে পা রাখলেও পড়তে আগ্রহী হয় না, পড়াশোনার বাঁধাধরা জীবন তাদের হয়তো বা ভাল লাগে না। তারা রাস্তার ধারে খেলাধুলা করে, ময়লার স্তূপে কাগজ কুড়িয়ে জীবন অতিবাহিত করতে বেশি ভালবাসে। কিন্তু এ শিশুরাও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটা অংশ, আমাদের সমাজ-কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। জাতীয় উন্নয়নে এদেরও রয়েছে অংশীদারিত্ব। এদের শিক্ষার আলো বিতরণ করার উপায় কী?

জলবন্দি হাওর-বাঁওড় অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অথৈ জলরাশি পাড়ি দিয়ে বর্ষাকালে বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। প্যাক, কাদা পাড়ি দিয়ে স্কুলে হাজির হলেও বিরূপ আবহাওয়ার কারণে ক্লাস হয় না। যে দিন শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে আসে সেদিন শিক্ষার্থীরা আসে না। আবার যে দিন শিক্ষার্থীরা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পড়তে আসে সে দিন শিক্ষকরা আসতে পারে না দূরদূরান্ত থেকে। এভাবে গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানে বর্ষাকালে পড়াশোনা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রামের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে থাকে টিনের চালা ঘর। ঝম ঝম বৃষ্টি হলে চালা ঘরে প্রচণ্ড শব্দ হয়। এই শব্দের কারণে শ্রেণী পাঠ দেয়া যায় না। ঘন অন্ধকার হয়ে যখন বৃষ্টি শুরু হতে থাকে তখন অনেক শিক্ষার্থী ভয়ে পালিয়ে যায়। আবার অনেকে ঝড়ঝাপ্টা এড়ানোর জন্য বিদ্যালয়ে আসে না। ইত্যাদি বহুবিধ কারণে বর্ষাকালে গাঁও-গেরামের শিক্ষা ব্যবস্থা হয় ব্যাহত।

জন্মগতভাবে কিছু সন্তান হয় উড়নচণ্ডী স্বভাবের। তারা বাবা-মার শাসন মানতে চায় না। বাঁধাধরা ছকবন্দি জীবন তাদের কাছে অসহনীয় মনে হয়। এ ধরনের শিশুরা স্কুলে গেলেও বই-কলমে বাঁধা থাকতে চায় না। সে নিজে এলোমেলো জীবন-যাপন করে, এমনকী আরও দুইটা শিক্ষার্থীকে সঙ্গ দোষে খারাপ দিকে ঠেলে দেয়। শিক্ষকরা এ সব শিক্ষার্থীকে সামলাতে হিমশিম খেতে থাকে। এক পর্যায়ে শিক্ষা জগৎ থেকে বেরিয়ে বখাটে ছেলেদের তালিকায় নাম লেখায়। অথবা রাস্তা-ঘাটে দাঁড়িয়ে অশালীনভাবে আড্ডা দিতে থাকে। এরা অকৃতকার্যের খাতা ভারি করে অপরাধ জগতে পা রাখে, করে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি। এদের জন্য গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে রুচি বোধের দিকে খেয়াল রেখে বয়সানুপাতিক কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। কেননা এখান থেকেই চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী ইত্যাদি অনৈতিক চরিত্রের জনগোষ্ঠী তৈরি হয়। এদের সামাজিক বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করবে কে বা কীভাবে? এরা আমাদের সমাজভুক্ত জীব। এদের চাইলেই সমাজচ্যুত করতে পারব না। তাই এদের পুনর্বাসনে আকর্ষণীয় পন্থা বের করার জন্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও আগ্রহশীল হওয়া দরকার।

অভাব-অনটনের যাঁতাকলে পিষ্ট গ্রামের অভিভাবকরা পেটের ভাত জোগাড় করতে পারলেও শিক্ষার্থীর পড়ার খরচ বহন করতে পারে না। বই খাতা ক্রয় থেকে শুরু করে জামা-কাপড়, স্কুল ব্যাগ, পায়ের স্যান্ডেল অতঃপর প্রাইভেট পড়ার জোগান দিতে অধিকাংশ মা-বাবা থাকে অপারগ। কৃষক তার সন্তানকে ফসল তোলার মৌসুমেও বীজ বপনের সময়ে কৃষিকাজে নিয়োজিত রাখতে চায়। মা চায় তার মেয়ে সন্তানটি গৃহ কাজে সহায়তা করুক। আবার অনেক মা-বাবা ভাবে তার সন্তানটি তো আর জজ-ব্যারিস্টার হবে না, কৃষি কাজই করতে হবে। অতএব এত বেশি পড়িয়ে কি হবে? মেয়ে সন্তানটিকে বড়জোড় এসএসসি পাস করানোর পর বিয়ে দিয়ে দেয়। ফলে হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়া উচ্চ শিক্ষায় যেতে পারে না। নিম্ন আয়ের অভিভাবকরা মেয়েকে সাক্ষরজ্ঞান করার পর অর্থ উপার্জনের কাজে লাগিয়ে দেয়। মেয়েরা দল বেঁধে শহরে গার্মেন্টসে অল্প আয়ের কাজ করতে চলে যায়। এই যদি হয় গ্রামের অভিভাবকদের দৃষ্টি ভঙ্গি তাহলে গ্রাম্য শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে কীভাবে?

গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। চেয়ার টেবিলের অভাব তো রয়েছেই, রয়েছে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের অভাব। অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকরা অজপাড়াগাঁয়ের প্রতিষ্ঠানে থাকতে চায় না। আবার পুরনো শিক্ষকরা নিত্যনতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করতে আগ্রহী হয় না।

ফলে পরিবর্তিত সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিটি বইয়ের সংযোজিত নতুন অধ্যায়গুলো সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা থাকে খুবই সীমিত। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু শিক্ষা দেবে কীভাবে? এ সব প্রতিকূলতার পরও আজকাল গ্রামের মানুষরা বুঝতে পেরেছে নিজেদের দুর্ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই পেটের ভাত থাকুক আর নাই বা থাকুক প্রতিটি গ্রামের শিক্ষার্থী বই খাতা বগলে নিয়ে পৌঁছে যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রাইমারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের তুলনায় আনুপাতিক হারে মেয়েদের সংখ্যা অধিক। মেয়েরা সংখ্যায় শুধু অধিক নয়, তারা মেধাবী ও বাধ্যগত। তাদের উপস্থিতিও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের। ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সময় মতো প্রতিদিন প্যাক কাদা পেরিয়ে পৌঁছে যায় দূরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

এসব গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ফুটোচালার ঘরে বসে কুপির আলোর সামনে মেলে ধরে তার পড়ার বইটি। প্রচণ্ড গরমে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপন যখন প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পরে, তখন গ্রামের শিক্ষার্থীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে করে বিদ্যার্জন। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎসংযোগ নেই। সীমানা প্রাচীর না থাকায় গরমে অতিষ্ঠ শিক্ষার্থীরা মধ্যাহ্ন বিরতির পর ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। গ্রামের মা-বাবারা সবচেয়ে বেকায়দায় আছে তাদের ছেলে সন্তানটিকে নিয়ে। ডিশ এন্টিনার টিভি মাধ্যম এ সব ছেলেদের নষ্ট আধুনিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা মোবাইল ফোনে কথা বলেও আজে বাজে কাজে সময় ফুরাতে বেশি পছন্দ করে। জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা অর্জন করা এই আবশ্যকীয় দায়িত্ব তারা তা বুঝতে চায় না। আবার যে বয়সে বুঝতে পারে তখন আর আফসোস করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। তাই দিন দিনই গ্রামের প্রতিষ্ঠানে ছেলে শিক্ষার্থীর হার কমে যাচ্ছে। কি পন্থা অবলম্বন করলে এসব শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় সংযুক্ত করা যাবে তা ভেবে দেখা দরকার।

এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ভরে যেত গ্রামের শিক্ষার্থী দিয়ে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জজ-ব্যারিস্টার ইত্যাদি উচ্চ পদস্থ মেধাবী কর্মকর্তা গ্রামেই জন্ম নিত। শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন পরিবর্তিত হওয়ায় বর্তমান গতিধারায় গ্রামের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসতে পারছে না। তারা গ্রামের আলোছায়ায় বিশুদ্ধ বাতাস সেবন করতে পারলেও পড়াশোনা করার উন্নত সুযোগ সুবিধা পায় না। ইচ্ছে করলেই গ্রামের শিক্ষার্থীটি কোচিং বা প্রাইভেট পড়ার সুবিধাটি পায় না। ফলে জটিল বিষয়গুলো অক্ষরজ্ঞান হীন আবার সন্তানটি সহজভাবে আত্মস্থ করতে পারে না।

ফলে তার অর্জিত জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক সঙ্কুচিত হয়ে পরে। নিজের দেশের বা বিশ্বের এ প্রান্তে ও প্রান্তে কি ঘটছে তা সে জানতে পারে না নিত্যদিন। এই শিক্ষার্থীটি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তখন সীমিত মেধা দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। আবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। ফলে গণ্ডমূর্খ কৃষকের সন্তানটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে গেলেও অংশগ্রহণ করতে পারে না। এভাবেই গ্রামাঞ্চল মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে। মন্দের ভাল হলেও গ্রামের অতি আগ্রহী শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অনার্স মাস্টার্স পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। অগতির গতি হিসাবে এ সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের স্বাদ পাচ্ছে। আজকাল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষায় যুক্ত এমন শিক্ষার্থী গ্রামেগঞ্জে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পরার পর যে স্বল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে সেটাই বা কম গর্বের নয়।

মেয়েদের শিক্ষাকে করা হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক। বই খাতা ক্রয় ও ফরম ফিলাপ করার জন্য দেওয়া হচ্ছে সরকারি কোষাগার হতে মেয়েদের উপবৃত্তি। আজকাল ইচ্ছে করলে অনায়াসে মেয়েরা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে বিনা খরচে। উপবৃত্তির সুফল হিসেবে মেয়েরা বিপুল পরিমাণে শিক্ষিত হচ্ছে। কেউ কেউ এসএসসি বা এইচএসসি পাসের পর নিজেকে নিয়োজিত করছে কর্মের বিভিন্ন স্তরে। এভাবে মেয়েদের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আসলে নারী নির্যাতনের হার কমে আসবে।

গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষাটি সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর হার অবলীলা ক্রমেই কমে আসছে। বিজ্ঞান বিষয়টি অধিক জটিল, তা ছাড়া এ বিষয়ে অর্থ খরচ করে প্রাইভেট পড়তে হয় বলে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান পড়তে চায় না। তাই দিন দিন গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলো বিজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় গ্রামের বিজ্ঞান শিক্ষকদের উপায় কি হবে? শত অব্যবস্থা ও প্রতিকূলতার পরও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নয়নগামী করতে হবে। অন্যথায় জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে না। শিক্ষার যেমন বিকল্প নেই ঠিক তেমনি গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সকল দৈন্যদশা কাটিয়ে ওঠে কাদামাটির গাঁও-গেরামের শিক্ষা হবে অগ্রসরগামী জাতীয় স্বার্থে সেটাই সবার কাম্য।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও সদস্য বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী-অবসর সুবিধা বোর্ড